বিদ্রোহী বঙ্গ।

লক্ষ বছরে কেউ কারো সাথে পরামর্শ করে ঠিক করেনি নামটা। জার্মানীরা বলে, ডয়েস ল্যান্ড উইলবার অ্যালেস - পিতৃভূমির জয় হোক। কিন্তু বাকী প্রায় সবাই জন্মভূমিকে তুলনা করে জননীর সাথে, - বলে মাদারল্যান্ড অর্থাৎ মাতৃভুমি। বাঙালী বলেছে, - মাতৃভূমির বন্দনা করি, বন্দে মাতরম্*(নীচে দেখুন)। বলেছে, - সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শষ্য-শ্যামলাং মাতরম্। আরও বলেছে, জননী-জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। সেই স্বর্গের চেয়েও মহীয়ান আমার মাতা ও মাতৃভূমি - যার জন্য মানুষের আজন্ম সাধনা। এই দুই হল হ্যামিলনের মোহনবাঁশীর দু'টো সুর যার বলে অসীমকে বুকের পাঁজরে ধারণ করে সসীম মানুষ। এ বাঁধন কত প্রবল হলে শিশিরবিন্দু তার ছোট্ট বুকে ঝলমলে ধরে রাখে সুবিশাল সূর্য্য। এ রকম ঐশী সংবাদের শক্তিতেই আমরা ''আমারে দেখিয়া আমার না-দেখা জন্মদাতারে চিনি'', না হলে কে কবে তাঁকে দেখেছে? সেই অন্তর্গত সংবাদেই তো উচ্চারিত হয় জলদগম্ভীর - দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ হে মাটির মানুষ, ভুলেও যেন ইমানের অঙ্গহানী কোর না কেউ।

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

একথা জানত প্রাচীন পৃথিবীর মানুষ, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। গলা ভরা গান আর গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ আর ফলে ভরা গাছের এমন আরামের এমন সম্পদের দেশ বেশী নেই দুনিয়ায়। এখানে তাই কোনমতে মাতব্বরিটা কব্জা করতে পারলেই কেল্লা ফতে। এই হল কাল। আপনা মাংসে হরিণা বৈরী। নিজের শরীরের সম্পদই হরিণের শত্রু, সেজন্যই সে মারা পড়ে। বারবার মারা পড়েছে বাংলাও। কি যে অনন্ত সম্পদ বাংলার ছিল তা আজ বাঙ্গালী ভুলেই গেছে যেন। অথচ সে সম্পদের জন্যই বার বার বাংলায় আঘাত হেনেছে বাইরের শত্রু, বার বার সে আঘাত ফিরিয়ে দিয়েছে বাংলার গর্বিত সন্তানেরা। কারণ, - ''যে শুনেছে কানে তাহার আহ্বান-গীত, ছুটেছে সে নির্ভিক পরাণে, নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি''। কখনো সে সফল, কখনো বিফল।

মাতার জঠরে মানুষের ভ্রূণকাল, আর মাতৃভূমির জঠরে তার আজন্ম জীবন। আর সেই কোলেই তার সর্বতাপের সমাপ্তির শেষ আশ্রয়।

কিন্তু শুধু মুখে বললেই তো হয় না, জননী-জন্মভূমির দায় যে বড় দায়! তার বুকে অনুপম জীবন-ধারা পানের শেষে ক্লান্ত ঘুমের শান্তি আছে, আছে ধরণীর খেলা সাঙ্গ করে ধুলিধুসরিত দেহে তার কোলে ফিরে আসার সুপ্তি। কিন্তু সেই সাথে আছে প্রাণ দিয়ে তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব, তাদের সম্ভ্রম রক্ষায় নিজেকে তিলে তিলে উৎসর্গ করার আর্ত আহ্বান যা আমরা সাফল্যের সাথে করেছি সাড়ে তিন হাজার বছর আগে, করেছি দু'হাজার বছর, পাঁচশ' বছর আগে, একশ' বছর আগে আর করেছি একাত্তরে। শত-সহস্র ঘটনা দেখেছে এ মাটি। দেখেছে হাজার হাজার আলীমুদ্দীন-সূর্য্য সেন আর কিছু মীর জাফর-গোলাম আজমের দল। দেখেছে পৃথিবীর আদি সভ্যতা, দেখেছে অজস্র রক্তপাত, দেখেছে কখনো হতমানে অপমানে বাঙ্গালীর ন্যুব্জদেহ আর কখনো তার অভ্রভেদী উন্নতশির। দেখেছে মগ-বর্গীদের অধীনে দাসত্ব, আবার দেখেছে চট্টলা থেকে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত বর্ণাঢ্য শাসনকর্তৃত্ব। দেখেছে ধনাঢ্য সময় যেখানে এক জগৎশেঠের অর্থসম্পদ পাল্লা দিয়েছে খোদ ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের সাথে, আবার কখনো দেখেছে দু'টো অন্নের অভাবে তিন কোটি বাঙ্গালীর উদ্বাস্তু বা না খেয়ে মরে যাওয়া এক কোটি মৃতদেহ পথে ঘাটে ছড়ানো ছিটানো। যে গল্পের মাত্রা দিগ্বলয়ের উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু - যার উচ্চতা হিমালয় আর গভীরতা অতলান্তিক, - তুলনা

আছে সে গল্পের?

বাংলাদেশ, জননী জন্মভুমি! লক্ষ ঊষার কিরণধন্য - কোটি গোধুলীতে ম্লানবিষন্ন - লক্ষ পুষ্পে অলিপুঞ্জিত - কোটি কোয়েলের কুহু-কুঞ্জিত - লাখো পুর্ণিমা জ্যোৎস্না-প্লাবিত - পদ্মা-মেঘনা-যমুনা ধাবিত-আলো ঝলমল স্বর্ণবরণী - কোটি জনমের হৃদয়হরণী - অবারিত মাঠ গগন ললাট চুমে যার পদধুলি, হাস্যময়ী লাস্যময়ী সেই আমার চিরকিশোরী অনন্যা মাতৃভূমি!

সে জন্যই তো - ‘‘আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই.....বাংলা আমার দৃপ্ত শ্লোগান-ক্ষিপ্ত তীর ধনুক, বাংলা আমার তৃষ্ণার জল-তৃপ্ত শেষ চুমুক’’। সে জন্যই তো - জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে সস্নেহ আলিঙ্গনের দু’হাত বাড়িয়ে আছে বাংলার যে বৃহৎ বিপুল প্রবাহ তার কিছু অস্ফুট কলধ্বনি শোনাই। ইতিহাসে এমন কিছু নেই যাতে বিতর্ক নেই, কিন্তু মোটামুটি গ্রহণযোগ্য সুত্রের ভিত্তিতে এগুলো লেখা। সুত্রগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সর্বত্র বিভিন্ন গ্রন্থে, হাত বাড়ালেই সেগুলো গল্প শোনানোর জন্য তৈরী হয়ে আছে। তাই সেগুলোর উল্লেখ না-ই বা থাকল। এ ‘‘গল্পিতিহাস’’ গুলোতে সন-তারিখ আর লব-কুশের বিশদ কন্টকারণ্যে মানবিক আবেগের অশ্রু-হাহাকার আর খুশী-উল্লাস না-ই বা হারাল।

এ সিরিজ লেখা হচ্ছে বিশেষভাবে মুক্তমনা’র নুতন ওয়েবসাইটের জন্য, এর কিছু নিবন্ধ বহু বছর আগের লেখা থেকে পুনর্লিখিত এবং বাকীগুলো নতুন। এতে বাংলার বিদ্রোহের কিছু আনুসঙ্গিক ঘটনাও থাকবে।

ধন্যবাদ
ফতেমোল্লা
১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস, ৩৪ মুক্তিসন (২০০৪)।

* বৃটিশ-আমলে বঙ্কিমের এ কবিতাকে দলীয়-সংগীত হিসেবে গ্রহন করেছিল কংগ্রেস। মাতৃভুমির বন্দনায় এর প্রথম ছত্রগুলো অতুলনীয়, কিন্তু পরের ছত্রগুলোতে দেব-দেবীর নাম আছে। হিন্দু ছাড়া আর কারো কাছে তা গ্রহনযোগ্য নয় বলে এ অপকর্মে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় চরিত্র নষ্ট হয়েছে।

****

প্রতিরোধ

(বিদ্রোহী বঙ্গ -১)

অসম্ভব।

না, কিছুতেই না। কিছুতেই আর পড়ে থাকব না এই শীত জর্জর রুক্ষ্ম মাটির দেশে। বছরে সাতমাস হিংস্র শীতকাল, একটা পাতা থাকে না গাছে! বরফের ওপর দিয়ে হু হু করে বয়ে যায় চন্ড তুষার ঝড় আর তীব্র ঠান্ডা বাতাস। শিকারের জন্য ঘর থেকে বেরোলেই হাড় অবধি বসে যায় তার ধারালো দাঁত। তিনমাসের গরমকালে প্রচন্ড পরিশ্রমেও বাঁজা মাটি দিতে চায় না অন্ন। কেন পড়ে থাকব এ পোড়া দেশে? সমস্ত পৃথিবীটাই নিশ্চয় এমন বৈরী নয়। যেখানেই হোক, যত দুরেই হোক, সুজলা সুফলা শষ্য-শ্যামলা দেশ একটা আছেই কোথাও। যেখানে ফল খেয়ে আঁটিটা ছুঁড়ে ফেললে পরদিন দেখা যাবে ছোট্ট দু’টো নধর

সবুজ পাতা। যেখানে এমন হিংস্র ঠান্ডা থাকবে না, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু জড়িয়ে রাখবে মাতৃগর্ভের আরামে আর চাইবার আগেই অন্নপূর্ণা মাটি ভরে দেবে দু'হাতের ভান্ড। ঘাইহরিণী আর টিপজোনাকীর সেই মনোহর দেশ আছেই কোথাও না কোথাও, চলো চলো যাই। গাঁঠরি বাঁধো মুসাফির!

উঠে দাঁড়াল আর্য্যরা, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সেই সুদুর রাশিয়ার সুদুর ভল্‌গা নদীর তীরে। সুজলা সুফলা শষ্য-শ্যামলা দেশের মায়াময় আহ্বান এসে লেগেছে তাদের ধমনীতে, রওনা হয়ে গেল তারা। সাথে সাথে রচিত হয়ে গেল ইউরোপ-এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অনাগত অগণিত মানবজাতির ভবিষ্যতের রূপরেখা। কি সুন্দর, মানব-ইতিহাসের কি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল সেটা।

পথ জানা নেই, দিক জানা নেই। মঞ্জিলের চেহারা স্বরূপ কিছুই জানা নেই। আছে শুধু দু'চোখ ভরা স্বপ্ন আর অদম্য আকাংখা। কে জানে কোথায় আছে সেই সোনার দেশ। এক দল চলল উত্তরে, এক দল দক্ষিণে। পথ দুর্গম, শত শত মানবগোষ্ঠি পড়ে পথে। দেখা হলেই লড়াই, আর প্রতিটি লড়াইয়ে আর্য্যদের অবধারিত বিজয় যেন ওরা বিজয়লক্ষ্মীর বরপুত্র। অন্যান্য গোত্ররা তখনও গাছ-পাথর আর চাঁদ-সুরুজের আরাধনা করছে, অনেকের ভাষা বা পরিধেয় বলে কিছু নেই, পাথরের অস্ত্র সম্বল। আর আর্য্যদের আছে ভাষা, পশুপালন আর ধাতব অস্ত্র। সেই সাথে আছে উপলব্ধির বিকাশ। তাদের আছে বস্তুর অতিত অতিন্দ্রীয় স্রষ্টা-দর্শন, যা পরবর্তিকালে পরিণত হয়েছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ধর্মে। অগণিত যুদ্ধে বিজয়ী হতে হতে আর্য্যরা ভুলেই গেছে পরাজয় কাকে বলে।

সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এগিয়ে চলেছে তারা স্বপ্নে দেখা রাজকন্যার মত ভুবন ভোলানো মাটির টানে।

উত্তর-পথিকরা ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, ওরাই এখন অনেক ইউরোপবাসীর পুর্বপুরুষ। এই আর্য্য-রক্তেরই গর্বে মেতেছিল হিটলার। দক্ষিন-পথিকদের এক হাজার বছর লেগে গেল আফগানিস্তান পৌঁছতে। তারপর রণে ভঙ্গ দিয়ে একদল স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধল ইরাণে গিয়ে। ওরাই আজকের ইরাণীদের পুর্বপুরুষ। অন্যদল চলল আরও দক্ষিণে, অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী তাদের চাই-ই চাই। বিষ-পিঁপড়ের মত জেদী তারা, একবার কামড় দিয়ে ধরলে যতই টানো কামড় ছাড়বে না সে। জোরে টানলে মাথা থেকে শরীর ছিঁড়ে চলে আসবে, কিন্তু ছেঁড়া মাথাটা তখনও কামড় দিয়ে পড়ে থাকবে। ক্লান্তিহীন পথ চলার বিরাম নেই, আরও দু'শ বছর পর পাঞ্জাব। সেখান থেকে গঙ্গার ধার ধরে পুবে এগোতে এগোতে বিহারের ভাগলপুরে এসে থামল আর্য্যরা।

থামল, আর দু'চোখ তুলে দেখল সামনে বিস্তীর্ণ বদ্বীপ, জলস্থলের মাদুর। সুজলা, সুফলা, শষ্যশ্যামলা।

মনে ঝড়, চোখে অশ্রু। এই তো সেই! এই তো সেই জগদ্ধাত্রী অন্নপুর্ণা - যার মায়াময় হাতছানিতে দেড়-দু'হাজার বছর আগে ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিল পুর্বপুরুষেরা! কত জন্ম-জন্মান্তর পার হয়ে গেছে তারপর, কত প্রজন্ম পৃথিবীর পথে পথে ঝরে গেছে শুধু এই অন্নপুর্ণার খোঁজে। পাহাড়ে-মরুতে দু'হাজার বছরের দিকচিহ্নহীন পথশ্রম, অসংখ্য যুদ্ধ, অজস্র রক্তক্ষয় যার জন্য সেই মাটি ঐ সামনে। এবারে মহাযাত্রার সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল চির-অপরাজিত উদ্ধত আর্য্যরা বদ্বীপের নরম মাটির ওপর।

ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সাথে সাথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ছিটকে ফিরে এল বিহারে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে

আছে আর্য্যরা। যা ঘটে গেছে তা কল্পনার বাইরে, ঘটে গেছে অসম্ভব। হাজার হাজার বছরের শত শত বিজয়ের পর এই প্রথম তাদের চিরবিজয়ী কপালে প্রতিরোধের বজ্রাঘাত হেনেছে কেউ। সে কপালে এই প্রথম পড়েছে পরাজয়ের কলংক-তিলক, সেখানে রক্তাক্ত হয়ে ফুটে উঠেছে গর্বিত বঙ্গসন্তানের প্রচন্ড পদাঘাতের দাগ। সামনের বদ্বীপে তখন বর্শা হাতে মাথা উঁচু করে রক্তচোখে তাকিয়ে আছে দেশের সন্তান নর এবং নারী। সবল, সুঠাম, বলদৃপ্ত।

অপমানে, রাগে দুঃখে পাগল হয়ে উঠল আর্য্যরা। সমস্ত শক্তি, অভিজ্ঞতা, জেদ আর ক্রোধ একত্রিত করে ঝাঁপিয়ে পড়ল আবার, আবার, এবং আবার। তারপর হাঁটু ভেঙ্গে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল বিহারের মাটিতেই। সামনে পুন্ড্রনগরে তখনো বর্শা হাতে মাথা উঁচু করে রক্তচোখে তাকিয়ে আছে দেশের সন্তান নর এবং নারী। সবল, সুঠাম, বলদৃপ্ত। মাতৃভুমির বন্দনা কিভাবে তা করতে হয় তারা তা জানে।

তাকানো যাক দলিলের দিকে। কোন দলিল, কার লেখা দলিল? আর কারো নয়, ওই আর্য্যদেরই লেখা। অন্য কখনও নয়, সেই আড়াই-তিন হাজার বছর আগেই লেখা। অন্য কোথাও নয়, ওই বিহারে বসেই লেখা, আর্য্যদের ঐত্তরীয় ইতিহাস আর তার পরে পরেই শতপথ ব্রাহ্মণ পৃথিবীর প্রাচীনতম ইতিহাস গ্রন্থের অন্যতম।

— ''পুন্ড্রদেশের অধিবাসীরা ক্ষত্রিয়'' - মানব ধর্মশাস্ত্র - আর্য্যদের।
— ''পুন্ড্রদেশের প্রধান শহর পুন্ড্রনগর। পুন্ড্রজাতিরা দস্যু ও শত্রু'' - ঐত্তরীয় ব্রাহ্মণ - আর্য্যদের।
— ''প্রাচ্যদেশের লোকদের তারা (আর্য্যরা) অছ্যুৎ, খুনেডাকাত, এসব তো বলেছেই, এমন কি ''অসুর'' বলতেও ছাড়ে নি। - ডঃ নীহার রঞ্জন রায় - প্রখ্যাত ঐতিহাসিক - এবং আরও অনেক সুত্র।

আমাদের পুর্বপুরুষের আড়াই-তিন হাজার বছরের পুরোন ধুলি-ধুসরিত অতি অস্পষ্ট ছবি, এখন একটু যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে এখন। পুন্ড্রদেশ হল রাজশাহী-দিনাজপুর-বগুড়া নিয়ে উত্তরবঙ্গ। দু'টো ধ্বংসাবশেষ আছে সেখানে, পাহাড়পুর আর মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড়ের প্রাচীন নাম পুন্ড্রনগর। উন্নত সভ্যতার সব কিছুই সেখানে আছে, আর্য্যদের মতই ধাতব অস্ত্র, পশুপালন, কৃষিকাজ এমনকি পয়ঃপ্রণালী পর্য্যন্ত। সে সভ্যতার সময় আজ থেকে তিন-সাড়ে তিন হাজার বছর আগে, ঠিক যখন বিশ্ব-বিজয়ী সাইক্লোন ভল্‌গা থেকে ভাগলপুর পর্য্যন্ত ছুটে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপর?

—''বিদেহ (উত্তর বিহার) হল পুবদিকে আর্য্যবসতির শেষ সীমা'' - শতপথ ব্রাহ্মণ - আর্য্যদের লেখা।
— ''আর্য্যরা বিজয়ীরূপে বাংলায় বসতি স্থাপন করিতে পারে নাই'' - পিতৃভুমি ও স্বরূপ অন্বেষণ -কামরুল হাসান* ও অন্যান্য অনেক সুত্র।

আরো একটু স্পষ্ট হয়ে এল না ছবিটা?

ধন্যবাদ।
১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস ৩৪ মুক্তিসন (২০০৪)
(* বাংলার ইতিহাসের ওপরে এই ছোট্ট অথচ অপূর্ব বইটা হারিয়ে গেছে। হালকা সবুজ প্রচ্ছদে নক্সী কাঁথার মাঠের নকশা। আশীর দশকে প্রকাশিত, প্রকাশকের নাম মনে নেই। এর একটা কপি কোথায় পাওয়া যাবে তা কেউ যদি জানান তবে কৃতজ্ঞ থাকব)।

ক্রমশঃ- বিদ্রোহী বঙ্গ-২